বিশ্ব-ভারতীর পূর্বাভাষ

তারিখ হিসাবে দেখলে ১৩২৮ সালে (১৯২১ খৃষ্টাব্দে) ৭ই পৌষ উৎসবের সময়ে বিশ্ব-ভারতী স্থাপিত হয়। কিন্তু এর সূত্রপাত তার অনেক আগে শান্তিনিকেতন আশ্রম প্রতিষ্ঠার ইতিহাসের সঙ্গে জড়িত।

ঠাকুর পরিবারের অতুল ঐশ্বর্য্য ও ভোগবিলাসের আয়োজনের মধ্যে একুশ বৎসরের যুবক দেবেন্দ্রনাথের সামনে কোথা থেকে উড়ে এসে পড়ল উপনিষদের একখানি ছেঁড়া পাতায় একটী শ্লোক :—

ঈশাবাস্যমিদং সর্বং যৎকিঞ্চ জগত্যাং জগৎ
তেন ত্যক্তেন ভুঞ্জীথা মা গৃধ কস্যসিদ্ধনং।

মনে প'ড়ে গেল রামমোহনের কথা। শৈশবকাল অবধি রামমোহনের সঙ্গে তাঁর সংশ্রব। রামমোহনের প্রশান্ত ও গম্ভীর মূর্তি তাঁর মনে চিরদিনের জন্য মুদ্রিত হ'য়ে আছে। অত্যন্ত ব্যাকুলতার মধ্যে রামমোহন সম্পাদিত ইশোপনিষদের একটী শ্লোক দেবেন্দ্রনাথকে পথ দেখিয়ে দিলে।

পাঁচ বৎসর পরে, ১২৫০ সালে (১৮৪৩ খৃষ্টাব্দে) ৭ই পৌষ তারিখে দেবেন্দ্রনাথ দীক্ষা গ্রহণ করেন।

বোলপুর ষ্টেশন থেকে রায়পুরের পথে এক জায়গায় বিস্তৃত প্রান্তর, 'যতদূর দেখা যায় শুধু তৃণশূন্য তরঙ্গায়িত রক্তবর্ণ মরু-প্রান্তরের অবাধ প্রসার আর উপরে বর্ণচ্ছটা-বিচিত্র অসীম আকাশ'। মাঠের মাঝখানে শুধু দুইটী ছাতিম-গাছ। ১২৬৮ সালে (১৮৬১ খৃষ্টাব্দে) রায়পুরের সিংহ পরিবারের নিমন্ত্রণ রক্ষা করতে বোলপুরে গিয়ে জায়গাটী তাঁর বড়ো ভালো লাগলো। এখানে তাঁর নির্জন সাধনার উপযোগী একটী বাগান ও বাড়ী করার জন্য ১২৬৯ সালে জমি নেওয়া হয়। ছাতিম-গাছের তলায় তাঁর সাধনার স্থানে বেদীর উপর এখন লেখা আছে :—

"তিনি আমার প্রাণের আরাম, মনের আনন্দ, আত্মার শান্তি।"

এই শান্তিনিকেতনের আশ্রমের ব্যবস্থা-পত্রে আছে যে, এই আশ্রমে জাতিবর্ণ-নির্বিশেষে যে কোনো দেশের লোক ঈশ্বরোপাসনা করতে পারবেন ; এখানে সকলের অবাধ প্রবেশ।

মহর্ষির দীক্ষা ও শান্তিনিকেতন প্রতিষ্ঠার দিন, ৭ই পৌষের উৎসব উপলক্ষে, রবীন্দ্রনাথ বলেছেন :—

"বহুকাল পূর্বে কোন্ একদিনে মহর্ষি দীক্ষা গ্রহণ করেছিলেন, সে ক'জন লোকই বা জানত? কিন্তু এই দীক্ষা-গ্রহণ ব্যাপারটীকে সেই সুদূর কালের ৭ই পৌষ নিজের কয়েক ঘণ্টার মধ্যে নিঃশেষ ক'রে ফেল্‌তে পারে নি। সেই একটী দিনের মধ্যেই একে কুলিয়ে উঠ্‌ল না। সেদিন যার খবর কেউ পায়নি এবং তার পরে বহুকাল পর্যন্ত যার পরিচয় পৃথিবীর কাছে অজ্ঞাত ছিল সেই ৭ই পৌষের দীক্ষার দিন আজ অমর হ'য়ে বাৎসরিক উৎসবের দিনে পরিণত হয়েছে।"

এই আশ্রমটীর মধ্যে তপোবনাত্মজ ভারতবর্ষের ও অনাগত কালের একটী নিগূঢ় আবির্ভাব আছে।

(খ)

কবির বাল্যকাল থেকেই তাঁর জীবনে রামমোহন ও দেবেন্দ্রনাথ এই দুই মনীষীর প্রভাব বিশেষভাবে কাজ করেছে। রামমোহন সম্বন্ধে তিনি এক জায়গায় লিখেছেন :—

"তিনি মনুষ্যত্বের ভিত্তির উপরে ভারতবর্ষকে সমস্ত পৃথিবীর সঙ্গে মিলিত করবার জন্য একদিন দাঁড়াইয়াছিলেন। কোনো প্রথা কোনো সংস্কার তাঁহার দৃষ্টি অবরুদ্ধ করতে পারে নাই। আশ্চর্য উদার হৃদয় ও উদার বুদ্ধির দ্বারা তিনি পূর্বকে ত্যাগ না করিয়া পশ্চিমকে গ্রহণ করিতে পারিয়াছিলেন। তিনিই একলা সকল দিকেই নব্য বঙ্গের পত্তন করিয়াছেন। এইরূপে তিনিই স্বদেশের লোকের সকল বিরোধ স্বীকার করিয়া আমাদের জ্ঞানের ও কর্মের ক্ষেত্রকে পূর্ব হইতে পশ্চিমের দিকে প্রশস্ত করিয়া দিয়াছেন, আমাদিগকে মানবের চিরন্তন অধিকার সত্যের অবাধ অধিকার দান করিয়াছেন;—আমাদিগকে জানিতে দিয়াছেন আমরা সমস্ত পৃথিবীর; আমাদেরই জন্য বুদ্ধ, খৃষ্ট, মহম্মদ জীবন গ্রহণ ও জীবন দান করিয়াছেন। ভারতবর্ষের ঋষিদের সাধনার ফল আমাদের প্রত্যেকের জন্যই সঞ্চিত হইয়াছে, পৃথিবীর যে-দেশে যে-কেহ জ্ঞানের বাধা দূর করিয়াছেন, জড়ত্বের শৃঙ্খল মোচন করিয়া মানুষের আবদ্ধ শক্তিকে মুক্তি দিয়াছেন, তিনিই আমাদের আপন, তাঁহাকে লইয়া প্রত্যেকে

ধন্য। রামমোহন রায় ভারতবর্ষের চিত্তকে সঙ্কুচিত ও প্রাচীরবদ্ধ করেন নাই, তাহাকে দেশে ও কালে প্রসারিত করিয়াছেন, ভারতবর্ষ ও য়ুরোপের মধ্যে তিনি সেতু স্থাপন করিয়াছেন; এই কারণেই ভারতবর্ষের সৃষ্টিকার্য্যে আজও তিনি শক্তিরূপে বিরাজ করিতেছেন। কোনো অন্ধ অভ্যাস, কোনো ক্ষুদ্র অহঙ্কারবশতঃ মহাকালের অভিপ্রায়ের বিরুদ্ধে মূঢ়ের মতো তিনি বিদ্রোহ করেন নাই;—যে অভিপ্রায় কেবল অতীতের মধ্যে নিঃশেষিত নহে, যাহা ভবিষ্যতের দিকে উদ্যত, তাহারই জয়-পতাকা সমস্ত বিঘ্নের বিরুদ্ধে বীরের মতো বহন করিয়াছেন।"

"বাঙ্গালীর আশা ও নৈরাশ্য" (১২৮৪) প্রবন্ধে তিনি যেমন বাংলা দেশের আর্থিক দুরবস্থা ও তার প্রতিকারের সম্বন্ধে আলোচনা করেছেন, তেমনি সঙ্গে-সঙ্গে পূর্ব ও পশ্চিমের মিলনের কথাও বলেছেন।

"ইউরোপের স্বাধীনতা-প্রধান ভাব ও ভারতবর্ষের মঙ্গল-প্রধান ভাব, পূর্বদেশীয় গণ্ডীর ভাব ও পশ্চিম দেশীয় তৎপরভাব, ইউরোপের অর্জনশীলতা ও ভারতবর্ষের রক্ষণশীলতা, পূর্ব-দেশের কল্পনা ও পশ্চিমের কার্যকরীবুদ্ধি, উভয়ের মধ্যে সামঞ্জস্য হইয়া কি পূর্ণ চরিত্র গঠিত হইবে।"

তিনি কল্পনার চোখে দেখেছেন যে, ভবিষ্যতে ভারতবর্ষে আবার এমন সব জ্ঞানালোচনার স্থান গড়ে উঠেছে যেখানে পৃথিবীর নানা দেশ থেকে আগত অতিথি সমবেত। কিশোর চিত্তের উদ্বোধনের সঙ্গেসঙ্গেই তাঁর কবি-মনে বিশ্বভারতীর এই মূল-ভাবটীর পূর্বাভাষ উদ্বোধিত হয়েছিল।

৩০ বৎসর বয়সে রবীন্দ্রনাথ জমিদারীর ভার গ্রহণ করেন, সঙ্গে সঙ্গে বাংলা দেশের চাষীর সঙ্গে তাঁর যে ঘনিষ্ঠ পরিচয় সুরু হয় তারই ফলে চাষীর অভাব মোচন ও গ্রামের উন্নতি নিয়ে তখন থেকে গত চল্লিশ বৎসর তিনি অক্লান্ত পরিশ্রম ক'রে এসেছেন। ১২৯৯ সালে "শিক্ষার হেরফের" প্রবন্ধে তিনি বলেন যে, "শিক্ষা-ব্যবস্থাকে আমাদের প্রতিদিনকার জীবন-যাত্রার উপযোগী ক'রে তুলতেই হ'বে, নইলে জাতির রক্ষা নাই।"

ভারতবর্ষের এই নানা সমস্যা ও তার সমাধানের চিন্তায় রবীন্দ্রনাথের মনে ক্রমে প্রাচীন ভারতবর্ষের যে একটী ছবি গ'ড়ে উঠ্‌লো সে হচ্ছে তপোবনের মধ্যে লালিত ভারতবর্ষ। প্রাচীন ভারতবর্ষে সভ্যতার মূল প্রস্রবণ ছিল অরণ্যে, মানুষের মনের উপর বিশ্বপ্রকৃতির প্রভাব তার ভিতরকার ভাব। "নিখিল

চরাচরকে নিজের প্রাণের দ্বারা, চেতনার দ্বারা, হৃদয়ের দ্বারা, বোধের দ্বারা, নিজের আত্মার সঙ্গে আত্মীয়রূপে এক ক'রে পাওয়াই ভারতবর্ষের পাওয়া।"

"ভারতবর্ষের দুই বড়ো বড়ো প্রাচীন যুগ চ'লে গেছে,—বৈদিক যুগ ও বৌদ্ধ যুগ। সেই দুই যুগকে বনই ধাত্রীরূপে ধারণ করেছে।

"ভারতবর্ষের পুরাতন কথায় যা কিছু মহৎ, আশ্চর্য, পবিত্র, যা কিছু শ্রেষ্ঠ এবং পূজ্য সমস্তই সেই প্রাচীন তপোবন-স্মৃতির সঙ্গেই জড়িত। বড়ো বড়ো রাজত্বের কথা সে মনে ক'রে রাখবার চেষ্টা করেনি, কিন্তু নানা বিপ্লবের ভিতর দিয়েও বনের সামগ্রীকেই তার প্রাণের সামগ্রী ক'রে আজ পর্যন্ত সে বহন ক'রে এসেছে। মানব-ইতিহাসে এইটেই হচ্ছে ভারতবর্ষের বিশেষত্ব।"

১৩১-২ সালে লেখা "ব্রাহ্মণ", "ধনে ও রাজ্যে", "সভ্যতার প্রতি", "বন", "তপোবন", "প্রাচীন ভারত", "ঋতু-সংহার", "মেঘদূত" প্রভৃতি কবিতার মধ্যেও এই ভাবটী প্রকাশ পেয়েছে। কালিদাসের কাব্য সমালোচনা প্রসঙ্গেও রবীন্দ্রনাথ এই আদর্শের কথা বারবার বলেছেন। আসলে এ হচ্ছে কবির নিজেরই কথা। পনের বৎসর বয়সে লেখা, অধুনা-লুপ্ত, 'বনফুল' নামে ছোটো কাব্যটীতেও এই একই কথার আভাষ পাওয়া যায়।

বাংলা দেশের শিক্ষাসমস্যা নিয়ে ভাব্‌তে গিয়েও এই তপোবনের কথাই তাঁর মনে পড়েছে।—

"আমরা যদি মনে করি ভারতবর্ষের এই সাধনাতেই দীক্ষিত করা ভারতবাসীর প্রধান লক্ষ্য হওয়া উচিত তবে এটা মনে স্থির রাখতে হবে যে, কেবল ইন্দ্রিয়ের শিক্ষা নয়, কেবল জ্ঞানের শিক্ষা নয়, বোধের শিক্ষাকে আমাদের বিদ্যালয়ে প্রধান স্থান দিতে হবে। অর্থাৎ কেবল কারখানার দক্ষতা শিক্ষা নয়, স্কুল-কলেজে পরীক্ষায় পাশ করা নয়—আমাদের যথার্থ শিক্ষা তপোবনে—প্রকৃতির সঙ্গে মিলিত হ'য়ে তপস্যার দ্বারা পবিত্র হবে।"

তাই ব'লে প্রাচীন ভারতবর্ষের আদর্শের কথা বল্‌তে কবি কিন্তু আধুনিক বাংলা দেশের কথা ভোলেননি। তিনি নিজেই বলেছেন :—

"ভারতমাতা যে হিমালয়ের দুর্গম চূড়ার উপরে শিলাসনে বসিয়া কেবলি করুণ সুরে বীণা বাজাইতেছেন, এ কথা ধ্যান করা নেশা-করা মাত্র—কিন্তু ভারতমাতা যে আমাদের পল্লীতেই পঙ্কশেষ পানাপুকুরের ধারে ম্যালেরিয়া-জীর্ণ প্লীহা-রোগীকে কোলে লইয়া তাহার পথ্যের জন্য আপন শূন্য ভাণ্ডারের দিকে হতাশ দৃষ্টিতে চাহিয়া আছেন, ইহা দেখাই যথার্থ দেখা।"

আরও স্পষ্ট ক'রে লিখেছেন :—"অতএব আদর্শ বিদ্যালয় যদি স্থাপন করিতে হয় তবে লোকালয় হইতে দূরে নির্জনে, মুক্ত আকাশ ও উদার প্রান্তরে গাছপালার মধ্যে তাহার ব্যবস্থা চাই। সেখানে অধ্যাপকগণ নিভৃতে অধ্যয়ন ও অধ্যাপনায় নিযুক্ত থাকিবেন এবং ছাত্রগণ সেই জ্ঞানচর্চার যজ্ঞক্ষেত্রের মধ্যেই বাড়িয়া উঠিতে থাকিবে।"

"যদি সম্ভব হয় তবে এই বিদ্যালয়ের সঙ্গে খানিকটা ফসলের জমি থাকা আবশ্যক :—এই জমি হইতে বিদ্যালয়ের প্রয়োজনীয় আহার্য্য সংগ্রহ হইবে, ছাত্রেরা চাষের কাজে সহায়তা করিবে। দুধ ঘি প্রভৃতির জন্য গরু থাকিবে এবং গো-পালনে ছাত্রদিগকে যোগ দিতে হইবে। পাঠের বিশ্রামকালে তাহারা স্বহস্তে বাগান করিবে, গাছের গোড়া খুঁড়িবে, গাছে জল দিবে, বেড়া বাঁধিবে। এইরূপে তাহারা প্রকৃতির সঙ্গে কেবল ভাবের নহে কাজের সম্বন্ধও পাতাইতে থাকিবে।"

বিশ্বভারতী প্রতিষ্ঠার প্রাণ-উৎস সন্ধান ক'রে দেখতে গেলে আমরা দেখ্‌তে পাই যে, সুদূর ১২৫০ সালের ৭ই পৌষ যেদিন মহর্ষি দীক্ষা গ্রহণ করেন, সেইদিন সাধকের ধ্যানরত চিত্তে শান্তমদ্বৈতমের যে-মহিমা প্রকাশিত হ'য়েছিল এবং যে-মহিমার মঙ্গলালোকে শান্তিনিকেতনের আকাশ ও বনভূমি পরিপূর্ণ হ'য়ে আছে, বিশ্বভারতীর প্রকৃত উদ্বোধন সেই মহিমার প্রকাশে— সেই বহুদূর অতীত কালের ৭ই পৌষে। কবির চিত্তে তারই প্রেরণা এবং পরিপূর্ণ মানবতার মধ্য দিয়ে দেশ-সেবার এই ভাবের উদ্বোধনই বিশ্বভারতীর কার্য-সূচনার প্রাণ-স্বরূপ। তাই বিশ্বভারতী আজ নিখিল জগৎ-সভায় ভারতবর্ষের বিশিষ্ট সম্মানের আসনটী অনায়াসে অধিকার করেছে।